মুহম্মদ জাফর ইকবাল

বৈশাখের হাহাকার

একটা গল্প বলা যাক, বানানো গল্প নয়, সত্যি গল্প। যে মানুষটিকে নিয়ে গল্প, তিনি অত্যন্ত সুদর্শন। তাঁর বয়স চল্লিশের কোঠায়, পাঁচজন ছেলেমেয়ে আর প্রিয়তমা স্ত্রী নিয়ে তাঁর ভরভরন্ত সংসার। যে মাটিতে জন্ম হয়েছে, সে মাটির জন্য তাঁর বুকভরা ভালোবাসা। শুধু মাটি নয়, সেই মাটির মানুষগুলোকেও তিনি বুক আগলে রক্ষা করেন। মানুষটি স্বাধীনচেতা, অসম্ভব তেজস্বী, চারপাশের মানুষগুলো বিপদে-আপদে সবার আগে তাঁর কাছে ছুটে আসেন।

এ মানুষটি একদিন একটা বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরে আসছেন, সঙ্গে আরও তিনজন। ভর দুপুরবেলা তাঁর পথ আটকাল ছয়জন সাদা পোশাকের পুলিশ। কিছু বোঝার আগে তাঁদের সবাইকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে ফেলল। অ্যারেস্ট করেই তারা থামল না, কোথায় জানি তারা ফোন করে দিল। দেখতে দেখতে সেখানে দুই লরি-বোঝাই উর্দি পরা সশস্ত্র মানুষ এসে হাজির। একজন নয়, দুইজন নয়, সেখানে ৪০ জন সশস্ত্র মানুষ–তারা সেই নির্ভীক মানুষ আর তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে গেল তাদের ক্যাম্পে।

সুদর্শন সেই তেজস্বী মানুষটিকে জানালার গ্রিলের সঙ্গে বাঁধা হলো। তখন ঘরের ভেতর এলেন একজন অফিসার। গ্রিলে বাঁধা মানুষটির দিকে তাকিয়ে তখন তিনি তাঁর লোকজনকে আদেশ দিলেন–তাঁকে একটা উচিত শিক্ষা দিয়ে শায়েস্তা করতে।

অফিসারের আদেশ শুনে একজন নয়, দুইজন নয়, সেই বাহিনীর নয়জন সদস্য গ্রিলে বাঁধা মানুষটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এক অমানুষিক হিংস্রতা নিয়ে। একসঙ্গে সবাই তাঁকে মারতে শুরু করলেন। সে কী মার–একজন মানুষ হয়ে অন্য একজন মানুষকে কেমন করে এভাবে মারতে পারে? সুদর্শন তেজস্বী সেই সম্মানী মানুষটি প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন, কিন্তু কারও এতটুকু মায়া হলো না। মানুষটিকে তাঁরা মারতে থাকলেন এবং মারতে থাকলেন এবং একসময় রক্তবমি করতে করতে মানুষটি অচেতন হয়ে গেলেন। যখন আবার তাঁর জ্ঞান ফিরে এল, তখন তাঁরা আবার তাঁকে মারতে থাকেন–একবার নয়, বারবার, অসংখ্যবার। অর্ধমৃত মানুষটিকে তখন জানালার গ্রিল থেকে খুলে উল্টো করে বাঁধা হলো, ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হলো তাঁর নাক দিয়ে, নখগুলো টেনে টেনে আলাদা করা হলো তাঁর আঙ্গুল থেকে, হাতগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো আঘাত করে, পেরেক ঢুকিয়ে দেওয়া হলো হাতে-পায়ে। প্রচণ্ড অত্যাচারে হাতের একটা আঙ্গুল ছিন্ন হয়ে গেল। চোখগুলো খুবলে তুলে নেওয়া হলো, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করা হলো পৈশাচিক উন্মত্ততায় (আমি জানি, আমার লেখা পেলেই অনেক ছোট ছেলেমেয়ে সেটা পড়তে শুরু করে, আমি এই নির্যাতনের আরও অনেক কিছু জানি, তবু আমি সেই অংশটুকু বর্ণনা করতে চাই না)।

সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই মানুষের ওপর মানুষের এই অত্যাচারটুকু সহ্য করতে পারলেন না। তিনি পরম ভালোবাসায় এই তেজস্বী মানুষটিকে পৃথিবীর সব নৃশংসতা থেকে মুক্ত করে তাঁর নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁর প্রাণহীন দেহটি ঢলে পড়ল সেই সব অফিসার এবং নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর কিছু মানুষের পায়ের কাছে। সেই মৃতদেহটি নিয়ে তাঁরা আনন্দের অট্টহাসি হেসেছিলেন কি না, সে কথাটি কেউ জানে না। নিষ্ঠুরতাটুকু সম্পূর্ণ করার জন্য তাঁর মৃতদেহটি নিয়ে পৌঁছে দেওয়া হলো তাঁর প্রিয়জনের কাছে। তাঁর স্ত্রী আর সন্তানদের সঙ্গে সঙ্গে এলাকার মানুষের আর্তনাদ আর হাহাকারে নিশ্চয়ই সেই এলাকার আকাশ-বাতাস ভারী হয়েছিল। সৃষ্টিকর্তা তখন কী ঠিক করেছিলেন, কে জানে?

আমি জানি, যারা লেখাটুকু এ পর্যন্ত পড়ে এসেছে, তারা সবাই ভাবছে, আমরা তো শুধু মার্চ মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সেই ভয়ঙ্কর অমানুষিক অত্যাচারের কথা বলি, এখন তো এপ্রিল মাস শেষ হয়ে মে মাস চলে এসেছে, এখন কেন আমি সেই কথাগুলোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি, যে কথাগুলো আমরা ভুলে থাকতে চাই? তার কারণ ঘটনাটি আসলে মার্চ মাসের। তবে সেটি ১৯৭১-এর মার্চ নয়, ২০০৭ সালের মার্চ মাস। যে সমস্ত মানুষ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছে তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্য নয়, তারা আমাদের সেনাবাহিনীর সাহায্যপুষ্ট যৌথ বাহিনীর সদস্য। যে তেজস্বী মানুষটিকে যৌথ বাহিনী হত্যা করেছে, তিনি মধুপুরের একজন আদিবাসী নেতা, তাঁর নাম চলেশ রিছিল। আমি জানি, আমরা কেউ এটা বিশ্বাস করতে চাই না, কিন্তু এটি সত্য।

ঠিক কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি সঠিকভাবে না জানলেও চলেশ রিছিলের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মুখ থেকে শোনা ঘটনায় তা জানা যায়। চলেশ রিছিলের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহটি দেখেও তাঁর ওপর অত্যাচারের প্রক্রিয়াটি অনুমান করা যায়। চতুর্দশ সার্ক সম্মেলনে প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পাঠিয়েছে। সেই বর্ণনাটুকু যারা পড়েছে, শুধু তারাই বলতে পারবে মানুষের নৃশংসতা কোন পর্যায়ে যেতে পারে।

২.

প্রশ্ন হলো, কেন সেনাবাহিনীর সাহায্যপুষ্ট যৌথ বাহিনীর একজন বাঙালি অফিসার তাঁর সঙ্গের কিছু মানুষকে নিয়ে এই অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় চলেশ রিছিলকে হত্যা করেছেন? সেই কাহিনীটাও কি অবিশ্বাস্য নয়?

এটি শুরু হয়েছে ২০০৩ সালে, যখন জোট সরকার ঘোষণা করেছিল, মধুপুরে তারা একটা ইকোপার্ক করবে। চলেশ রিছিল থাকেন মধুপুরে। সেখানে থাকেন তাঁর মতো আরও অনেক গারো আদিবাসী। তাঁদের কারও সঙ্গে একটি কথা না বলে মধুপুরের তিন হাজার একর অরণ্য ঘিরে একটা দেয়াল তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হলো। এই ইকোপার্কের কারণে প্রায় ২৫ হাজার আদিবাসী উৎখাত হয়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কা দেখা দিল। হাজার বছর ধরে যে বাপ-দাদার ভিটেতে আদিবাসীরা আছেন, তাঁরা সবাই মিলে ২০০৪ সালের ৩ জানুয়ারি একটা বিশাল প্রতিবাদ মিছিল গড়ে তুললেন। শান্তিপূর্ণ সেই মিছিলে পুলিশ গুলি করল নির্বিচারে, অনেক মানুষ আহত হলো, মারা গেল পিরেন স্নাল।

প্রবল প্রতিবাদের মুখে বন বিভাগ তখন ইকোপার্ক স্থাপনের কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলো। কিন্তু তারা থেমে গেল না, স্থানীয় আদিবাসীদের বিরুদ্ধে তখন তারা মামলা করতে শুরু করল, মিথ্যা মামলা–একটি নয়, দুটি নয়, শত শত। প্রায় সব মামলাতেই

আসামি হিসেবে নাম রয়েছে চলেশ রিছিলের। তাঁর অপরাধ, তিনি ইকোপার্কের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে; সরল, নিরীহ, শান্তিপ্রিয় আদিবাসীদের শায়েস্তা করার জন্য শুধু মধুপুর এলাকাতেই মামলা করা হয়েছে পাঁচ হাজার!
এ দেশে যাঁরা ইকোপার্কের কথা বলেন, তাঁরা কিন্তু ইকোলজি শব্দটার সঙ্গে পরিচিত নন। ইকোপার্কের নাম দিয়ে তাঁরা আসলে প্রকৃতি, তার নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে ছিন্নভিন্ন করে সেখানে কিছু পিকনিক স্পট তৈরি করতে চান। সেখানে শহর থেকে মাইক বাজাতে বাজাতে মানুষজন এসে হিন্দি গান শুনতে শুনতে বিরিয়ানির প্যাকেট খাবে, তারপর পুরো এলাকাটাকে জঞ্জালে পরিপূর্ণ করে চলে যাবে। তা না হলে মধুপুরের মতো এলাকায় ইকোপার্কের নাম দিয়ে কেউ ১০টা পিকনিক স্পট তৈরি করতে চায়? ছয়টা ব্যারাক তৈরি করতে চায়?
চলেশ রিছিলের নেতৃত্বে স্থানীয় আদিবাসীদের প্রবল প্রতিবাদের মুখে বন বিভাগ ইকোপার্কের কাজ স্থগিত করলেও হাল ছেড়ে দিল না, তারা সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকল। সুযোগ এল ১১ জানুয়ারি, যখন দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হলো। বন বিভাগ তখন জরুরি অবস্থার ঢাল হাতে নিয়ে আবার সেই রুচিহীন কুৎসিত ইকোপার্ক তৈরি করার কাজে লেগে গেল। আদিবাসীরা আবার প্রতিবাদ করতে নেমে এলেন; আবার নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন চলেশ রিছিল। ইকোপার্কের কাজ বন্ধ হলো সত্যি, কিন্তু চলেশ রিছিল জানতেও পারলেন না–তিনি তাঁর মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করে দিয়ে এলেন।
ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখে যৌথ বাহিনীর একজন ওয়ারেন্ট অফিসার আরও কিছু লোকজন নিয়ে চলেশ রিছিলের গ্রামে হানা দিলেন। তাঁকে না পেয়ে যৌথ বাহিনী অন্যদের সঙ্গে তাঁর স্কুলপড়ুয়া ছেলেদের ধরে নিয়ে গেল ক্যাম্পে। তারপর সেই কিশোর-তরুণদের ওপর সে কী অত্যাচার! মানুষ হয়ে কেমন করে অন্য মানুষের ওপর এমনভাবে অত্যাচার করে?
যৌথ বাহিনী হাল ছেড়ে দিল না, তারা চোখ-কান খোলা রাখল। শেষ পর্যন্ত তারা চলেশ রিছিলের খোঁজ পেল; ১৮ মার্চ ২০০৭, একটা বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরে আসছিলেন। তাঁকে ধরে ফেলল পথের মধ্যে। এর পরের ইতিহাস সবার জানা। নিজের মাটি, নিজের মানুষকে ভালোবাসার জন্য তাঁকে প্রাণ দিতে হলো এ দেশেরই যৌথ বাহিনীর কিছু সদস্যের হাতে। হ্যাঁ, সেনাবাহিনীর সাহায্যপুষ্ট এ দেশের যৌথবাহিনীর কিছু সদস্যের হাতে।

৩.

চলেশ রিছিলের স্ত্রী সন্ধ্যা রানী সিমসাংয়ের বয়স মাত্র ২৮। তিনি এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে পুলিশের কাছে মামলা করতে গিয়েছিলেন। এপ্রিলের ২ তারিখ পর্যন্ত পুলিশ সেই মামলা নেয়নি–আমার ধারণা, পুলিশ মামলা নেবে না। বাংলা ভাইয়েরা যখন মানুষকে খুন করে লাশ উল্টো করে গাছের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখত, তখনো পুলিশ মামলা নিত না। পুলিশের অনেক রকম বদনাম আছে–কিন্তু তারা নির্বোধ এই বদনাম নেই; তারা খুব ভালো করে জানে, কখন মামলা নিতে হয় আর কখন নিতে হয় না। কাগজে-কলমে এখন ক্ষমতা কার হাতে আর আসলে ক্ষমতা কার হাতে পুলিশ সম্ভবত সেটা আমাদের চেয়ে ভালো করে জানে। তাই একেবারে দিনেদুপুরে একজন মানুষকে খুন করে ফেললেও পুলিশ এখন কোনো মামলা নেবে না।
অন্যদের কথা জানি না, কিন্তু আমি নিজে একটা খুব বড় ধাক্কা খেয়েছি। প্রায় প্রতিদিনই এই সরকারের কেউ না কেউ অন্যায়, অবিচার আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলছেন। এ হত্যাকাণ্ডটি কি অন্যায় নয়? অবিচার নয়? তাহলে চলেশ রিছিলের স্ত্রী কেন এর বিচার চাইতে পারবেন না? চাঁদাবাজি করার জন্য যদি তারেক রহমানকে জেলে ঢোকানো সম্ভব হয়, তাহলে মানুষ হত্যা করার জন্য কেন যৌথ বাহিনীর কিছু অফিসারকে জেলে ঢোকানো যাবে না? চাঁদাবাজি থেকে কি মানুষকে হত্যা করা আরও অনেক বড় অপরাধ নয়?
জোট সরকারের আমলে একটা সময় ছিল যখন দেশে কেউ কোথাও বিচার চাইতে পারত না। যারা অন্যায়-অবিচার করত, তারাই আবার দেশ চালাত। বিচারটা কার কাছে চাইবে? আমরা তখন খবরের কাগজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, সেটাই ছিল আমাদের জজ কোর্ট, আমাদের হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট। জয়নাল হাজারী যখন সাংবাদিক টিপু সুলতানের হাত-পা ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়েছিলেন, তখন তাঁর বিচার করেছিল সংবাদপত্র! আহত সেই সাংবাদিকের ওপর নৃশংস অত্যাচারের কথা খবরের কাগজে বড় বড় করে দিনের পর দিন ছাপা হয়েছিল, সারা দেশের মানুষ তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই অবিচার, সেই নৃশংসতা নিয়ে দেশের মানুষ খবরের কাগজে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
বাংলা ভাইয়ের দলবল যখন একেবারে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় মানুষের ওপর নৃশংস অত্যাচার শুরু করেছিল, তখন জোট সরকারের যুদ্ধাপরাধী মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সে কথা বিশ্বাস করেননি। বলেছেন–এগুলো মিথ্যে কথা, সাংবাদিকদের বানানো গল্প। সাংবাদিকেরা এক মুহূর্তের জন্য থামেননি, দিনের পর দিন সংবাদপত্রে লিখে গেছেন। তা না হলে এ দেশে এই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এ রকম ঘৃণার কেমন করে জন্ম হলো? জঙ্গি নেতাদের ফাঁসি হওয়ার পর সাধারণ মানুষ কত বড় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে সবাই কি লক্ষ করেছে?
অথচ চলেশ রিছিলের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর কোথাও কোনো লেখালেখি নেই। কবি নির্মলেন্দু গুণের একটা দুঃখী কবিতা দেখেছি। ডেইলি স্টার-এ বিদেশের কিছু তরুণ-তরুণী লিখেছেন, কিন্তু বাংলাদেশের মূলধারার সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীরা কেউ কিছু লিখছেন না কেন? এত বড় একটা অবিচার দেশের মানুষ মুখ বুজে সহ্য করবে?

৪.

এই সরকার জানে কি না জানি না, শুরুতে তারা কিন্তু ছিল খুব জনপ্রিয় সরকার। তারা জনপ্রিয় ছিল, তার কারণ সাধারণ মানুষ যা চায় তারা ঠিক সেই কাজগুলো করছিল, দুর্নীতিবাজদের ধরছে, শাস্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করছে। আমি ঠিক জানি না–সরকারটি যেহেতু নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসেনি, তাই দেশের মানুষ তাদের সম্পর্কে কী ভাবছে, তারা সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় কি না। যদি মাথা ঘামায়,

তাহলে কিন্তু খুব ঠান্ডা মাথায় তাদের একটা জিনিস ভাবতে হবে–সেনাবাহিনীর সাহায্যপুষ্ট যৌথ বাহিনীর কিছু অফিসারের কারণে তারা তাদের সব অর্জনকে ধূলিসাৎ করে দেবে কি না। দেশের খবরের কাগজ চলেশ রিছিলকে নিয়ে রহস্যময়ভাবে নীরব থাকতে পারে, দেশের বাইরের মানুষজন কিন্তু নীরব নয়। চলেশ রিছিলের সেই রক্তাক্ত দেহের ছবি কিন্তু সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সরকার নিজের অজান্তেই কিন্তু দেশের বাইরে একটি স্বৈরাচারী নির্যাতনকারী সরকার রূপে চিত্রিত হচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান ড. ফখরুদ্দীন আহমদ ও সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ দেশ নিয়ে, দেশের মানুষ নিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই, থাকলে তাঁদের আমি অনুরোধ করতাম, চলেশ রিছিলের স্ত্রীর কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে–'এই দেশ নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন–আপনি কি সেই স্বপ্নের কথা বিশ্বাস করেন?'

আমি জানি, চলেশ রিছিলের স্ত্রী সেই প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে ঘৃণায় তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেবেন। আর কেউ জানুক আর না-ই জানুক, চলেশ রিছিলের স্ত্রী সন্ধ্যা রানী সিমসাং জানেন, ২০০৭ সালের বাংলাদেশে তাঁর কোনো স্বপ্ন নেই। যে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় তাঁর সন্তানদের জনককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়, সেই বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিচার চাওয়ার জন্যও এই বাংলাদেশে তাঁর কোনো জায়গা নেই।

৫.

আমি জানি না, আমার এ লেখাটি প্রথম আলোয় ছাপা হবে কি না। যদিও মুখে বলা হচ্ছে, সংবাদপত্রে কোনো বাধা-নিষেধ নেই, কিন্তু এখন জরুরি অবস্থা, কী ছাপা হতে পারে, কী ছাপা হতে পারে না–কে জানে, সেটা নিয়ে আসলে হয়তো বিধিনিষেধ আছে। যে মানুষগুলো এ হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছে তাদের নাম সবাই জানে, কিন্তু তা উচ্চারণ করতে সাহস পায় না। আমিও জানি আমি লিখেছিলাম, কিন্তু সেটা কেটে সরানো হয়েছে। পয়লা বৈশাখ আমি এই লেখাটি লিখেছিলাম, প্রথম আলো ছাপায়নি। অনেক বাহিনীর নাম সরানো হয়েছে, আমি এখনো জানি না–আদৌ লেখাটি ছাপা হবে কী না।

যদি এ লেখাটি ছাপা না হয়, তাহলে আমার হাতে লেখা এই কাগজগুলো নিয়ে আমাকে সেই মধুপুরের এক গ্রামে গিয়ে চলেশ রিছিলের স্ত্রী সন্ধ্যা রানী সিমসাংকে খুঁজে বের করতে হবে। পাঁচ সন্তানের সেই জননীর সামনে আমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না, মাথা নিচু করে বলতে হবে, 'আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। বিশ্বাস করুন, আমি চেষ্টা করেছিলাম।' আমি জানি না, তিনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন কি না।

চলেশ রিছিলের স্ত্রী সন্ধ্যা রানী সিমসাংয়ের পাঁচ সন্তানের সবচেয়ে বড়জনের বয়স ১৫, সবচেয়ে ছোটজনের বয়স মাত্র পাঁচ। ফিরে আসার সময় সবচেয়ে ছোট শিশুটির মাথায় হাত রেখে আমার খুব ফিসফিস করে বলার ইচ্ছে করবে, 'তুমি মন খারাপ কোরো না। দেখো, তুমি যখন বড় হবে তখন এই বাংলাদেশটি হবে তোমার বাবা যে রকম বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছিলেন ঠিক সেই রকম।'

ছোট শিশুটি আমার কথাটিতে কোনো গুরুত্ব দেবে কি না আমি জানি না, কিন্তু আমার এ কথাটি খুব বিশ্বাস করার ইচ্ছা করে।

বৈশাখ মাস দিয়ে একটা নতুন বছর শুরু হয়েছে। এই নতুন বছরকে ঘিরে বাঙালি, পাহাড়ি, আদিবাসী সবার মনে কত স্বপ্ন–কত আনন্দ! সবাই কি জানে, এই স্বপ্নের ঠিক মাঝখানে কারও কারও বুকের মধ্যে কী গভীর শূন্যতা, কী গভীর হাহাকার?

আমরা যদি এই হাহাকার শুনে ছুটে না যাই, কে যাবে?

৬.

খবরের কাগজে দেখেছি এই হত্যাকাণ্ডের জন্য, বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য এক সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছে। সুষ্ঠু তদন্ত করে অপরাধীর শাস্তি দিয়ে আমরা কী আমাদের এই গ্লানি থেকে মুক্তি দিতে পারব? বাংলাদেশের মাটিতে কখনো এই নিষ্ঠুরতার পুনরাবৃত্তি হবে না–সেটি নিশ্চিত করতে পারব?

মুহম্মদ জাফর ইকবাল: লেখক। অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।